Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
UGC Approved, Journal No: 48666
Volume-VII, Issue-III, January 2019, Page No. 08-20
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

রস প্রসঙ্গে শাক্তপদাবলি

ড. প্রদীপ বিশ্বাস

সহকারী অধ্যাপক।বাংলা বিভাগ, শম্ভুনাথ কলেজ, লাভপুর, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

*Indian Rasashastra or the concept of Rasa (**রস**) is one of the greatest contributions of its literary genius. Centering upon the theory of Rasa Indian poetics or rhetorical poems started its journey. From the great dramatist Bharata during the 2nd century B.C. to Jagannath in the 17th century A.D. this Shastra (**অলংকারশাস্ত্র**) has envolved. We find different Schools (**প্রস্থান**) like saprasthana (**রসপ্রস্থান**), Alamkarprasthana (**অলংকারপ্রস্থান**), Dhwaniprasthana (**ধ্বনিপ্রস্থান**). A question as to the soul or essence of these poetry naturally arises. Again, the question as regards why Indian rhetoricians (**আলংকারিক**) wrote their verses based on the conception of 'Annanda' (**আনন্দ**) is also pertinent and to be pondered over. According to them, the essence of a poetry is neither prosody nor style nor even Sound (**ধ্বনি**). The object of a greatest poetry is the creation of Rasa. It has taken thousand years to realize the theory of creation of Rasa. During the Indian Bhakti Movement at a letter point of time, a different of interpretation started emerging under the explicit influence of this movement. The 'Gouriya Rhetoricians' perceived Rasa to be the 'Bhakti Rasa' (**ভক্তিরস**). Therefore, the Rasa in Shaktapadavali written in a latter period must be judged from this perspective. In this article, we propose to study the nature of Rasa as found in the Shaktapadavali following the Indian conception of Rasa.*

Keywords: Indian Rasashastra-Variety of Rasa-Bhakti Rasa-Rasa in Shaktapadavali.

।১।

ভারতীয় রসতত্ত্ব প্রাচ্য মণীষার এক উজ্জ্বলতম নিদর্শন। রসতত্ত্বকে আশ্রয় করেই ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব বা অলংকারশাস্ত্রের পথ চলার শুরু। নাট্যাচার্য ভরতমুনি (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্বাব্দ ২য় শতক) রচিত 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থটি প্রাচ্যের কাব্যতত্ত্ব সম্বন্ধীয় আলাপ আলোচনার আদিতম গ্রন্থ। নাট্যশাস্ত্রেই প্রথম কাব্যরস বা নাট্যরসের আলোচনা স্থান পেয়েছে। কাব্যের আত্ম কী-এই প্রশ্নকে সামনে রেখে উদ্ভব ঘটেছে রসপ্রস্থান, অলংকারপ্রস্থান, রীতিপ্রস্থান, ধ্বনিপ্রস্থান প্রভৃতি প্রস্থান (Schools) বা আলংকারিক মতবাদের। ভরত থেকে শুরু করে সপ্তদশ শতাব্দীর

আলংকারিক জগন্নাথ পন্ডিত পর্যন্ত প্রায় দুই হাজার বছরের কাব্যতাত্ত্বিক আলাপ আলোচনার স্রোতে অবগাহন করেছেন আচার্য বামন, আচার্য দন্ডী, আচার্য রুদ্রট, আচার্য মম্মট, আচার্য অভিনবগুপ্ত, আচার্য আনন্দবর্ধন, বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রমুখ দিকপাল সব আলংকারিকগণ। তবে এঁরা সকলেই কাব্য এবং রস সম্বন্ধীয় আলাপ আলোচনা সিদ্ধান্তে ধর্মাশ্রিত রচনাকে বাদ দিয়ে আপনাদের সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেছেন। বাংলার গৌড়ীয় বৈষ্ণবমহাজন আলংকারিকগণ প্রথম প্রচলিত সিদ্ধান্তের ভিন্ন পথে অগ্রসর হয়েছেন। শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীরূপ গোস্বামী,সনাতন গোস্বামী, পরমানন্দ সেন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রমুখ গোস্বামীগণ জীবন এবং ধর্মকে এক করে দেখলেন। ধর্মাশ্রিত সাহিত্যের মধ্যে আবিষ্কার করলেন তাদের সাধ্য ও সাধনার সারতম উপলব্ধিকে। বাংলা ভাষায় রচিত বৈষ্ণবপদাবলি ও শাক্তপদাবলিগুলির রসতত্ত্ব এই চৈতন্যোত্তর মহাজন আলংকারিকদের সিদ্ধান্তের কষ্ঠিপাথরেই যাচাই করবার দাবি রাখে। আমাদের এই আলোচনায় শাক্তগানের রস প্রসঙ্গ আমরা সেই সমস্ত বঙ্গমণীষার সিদ্ধান্তের অনুসারেই বিচার করতে চাইবো। তার আগে জেনে নেওয়া যাক প্রচলিত অর্থে রস কাকে বলে, রসের আধার বা আধেয়ই বা কী।

।২।

'কোহয়ং রস'? 'রস' কী-?
আলংকারিক বিশ্বনাথ কবিরাজ বলছেন-
রস্যতে ইতি রস। ['সাহিত্যদর্পণ' ১/৩]।

অর্থাৎ, যা আস্বাদন করা যায় তাই-ই রস। নগেন্দ্রনাথ বসুও তার 'বিশ্বকোষ'- গ্রন্থে 'রস' প্রসঙ্গে লিখেছেন- "রসেন্দ্রিয় দ্বারা যে বস্তুর আস্বাদ গ্রহণ করা যায় তাহার নাম রস।"[১] রসতাত্ত্বিক অভিনবগুপ্তও রস বলতে 'আস্বাদ' গ্রহণের চমৎকারিত্বকেই চিহ্নিত করেছেন—

"শব্দসমর্প্যমাণহৃদয়সংবাদসুন্দরবিভাবানুভাবসমুদিত প্রাঙনিবিষ্টরত্যাদিবাসনানুরাগসুকুমার—
স্বয়ংবিদানন্দচর্বণব্যাপার-রমনীয় রূপো রসঃ।" ['ধ্বন্যালোক', লোচন ১/৪]

অর্থাৎ,"রস হচ্ছে নিজের আনন্দময় সম্বিতের (Consciousness) আস্বাদরূপ একটি ব্যাপার। মনের পূর্ব নির্দিষ্ট রতি প্রভৃতি ভাবের বাসনা দ্বারা অনুরঞ্জিত সম্বিত আনন্দময় সৌকুমার্য প্রাপ্ত হয়।"[২] কাব্যের বিভাব, ও অনুভাবের সহযোগে মানুষের চিত্তস্থিত স্থায়ীভাবগুলি উদবোধিত হয় এবং পাঠক আনন্দানুভূতি লাভ করেন। রসতত্ত্বের আদিগুরু ভরতমুনিও নাট্যরস প্রসঙ্গে লিখেছেন—

নহি রসাদ ঋতে কশ্চিদ্ অর্থঃ প্রবর্ততে।
তত্র বিভানুভাব ব্যাভিচারি-সংযোগাদ্ রস নিষ্পত্তি। ['নাট্যশাস্ত্র',৬।৩৪]

অর্থাৎ, রস ভিন্ন কোনো বিষয়ই প্রবর্তিত হয় না। নাট্য বিষয়ে বিভাব,অনুভাব ও ব্যাভিচারি ভাবের সংযোগ রসের নিষ্পত্তি হয়ে থাকে। এক কথায় 'রস' হচ্ছে পাঠকের এক অনির্বচনীয় আত্মোপলব্ধির বস্তু - এক লোকোত্তর আনন্দবোধ। কী ভাবে এই আত্মোপলব্ধি হয় তার একটু ব্যাখ্যা শুনে নিলে আমাদের মূল আলোচনার সুবিধা হবে।

জন্ম থেকেই মানুষ বেশ কিছু ভাব বা চিত্তবৃত্তি প্রাপ্ত হয়। এই চিত্তবৃত্তিগুলোর ক্ষয় বা লয়- কিছুই নেই। মানুষের 'বাসনালোকে' সংস্কাররূপে এই চিত্তবৃত্তিগুলো চিরজাগরূক থাকে। উপযুক্ত কারণের সংস্পর্শে এলে এই চিত্তবৃত্তিগুলোর অভিব্যক্তি ঘটে মানুষের দেহে এবং আচরণে। যেমন-'ভয়' মানুষের একটি 'ভাব' বা চিত্তবৃত্তি। ভয়ের কারণ ঘটলে মানুষ ভয় পায় এবং সেই ভয়ের অভিব্যক্তি তার আচরণে প্রকাশ পায়। মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। ঘন ঘন শ্বাস পড়ে। চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে যায় ইত্যাদি। লৌকিক কারণে যখন মানুষের ভয়ের অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয় তখন তা নিতান্তই সাধারণ ব্যাপার। তার সঙ্গে 'রস' বা আনন্দাস্বাদের কোনও সম্বন্ধ নেই। এই ভয় চিত্তবৃত্তির

উদ্বোধনের কারণ যখন কোনো কাব্য বা নাটক হয় হয় তখনই পাঠক চিত্তে রসের উদ্বোধন ঘটে। পাঠক তখন ভয় বোধের মধ্যেও শেষপর্যন্ত আনন্দের সন্ধান পান। কাব্য বা নাটকের দ্বারা ভয় চিত্তবৃত্তির জাগরণের যে কারণ ও প্রকাশ তাকেই অলংকার শাস্ত্রে 'বিভাব' ও 'অনুভাব' বলে। কাব্যের বিভাব, অনুভাবের দ্বারা মানুষের যে চিত্তবৃত্তির অনুরঞ্জন ঘটে সেই চিত্তবৃত্তিগুলিই 'রসে' পরিণত হয়।

ব্যাক্তি জীবনে আমরা কেউ-ই দুঃখ কষ্ট পেতে চায় না, পছন্দও করি না। সেই আমাদেরই প্রিয় গ্রন্থ বা প্রিয় নাটক বা প্রিয় সিনেমাটা দুঃখের হয়ে থাকে। পাঠক যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর তাবৎ ট্রাজিক কাহিনির প্রতি অসীম আগ্রহ দেখিয়ে আসছে। 'our Sweetest songs are those that tell of saddest thought'- এই কথার অমোঘ সত্যতা এই আনন্দস্বরূপ রসের আস্বাদনের কারণেই। কাব্যের সুখ, দুঃখ, হাসি-কান্না যখন পাঠক চিত্তের ভাবকে জাগরিত করে তখনই সেই ভাবের রস পরিণতি ঘটে। সুকবি, সুঅভিনেতা বা সুগায়ক পাঠক বা শ্রোতার চিত্তে এই রস উদ্বোধনের কাজটি করে থাকেন আপন প্রতিভার মহান ক্ষমতা বলে। এই ক্ষমতা ঐশী ক্ষমতা। শ্রেষ্ঠ কাব্য এবং মহাকবির লক্ষ্যই হল আনন্দরূপ রসের সৃজন। শ্রেষ্ঠ কাব্য 'আনন্দনিষ্যন্দি'। আলংকারিকের ব্যাখ্যায় এই রসানন্দ পরব্রহ্মস্বাদের সগোত্র। কাব্য স্রষ্টাও তাই ব্রহ্মা সমতুল্য 'কবিরেব প্রজাপতি' ['অগ্নিপুরাণ']। আলংকারিক ভট্টনায়কের কথায় রসানন্দ 'পরব্রহ্মস্বাদ সচিব'। বিশ্বনাথ কবিরাজ কথায়—

বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্। ['সাহিত্য দর্পণ', ১/৩]

রসাত্মক বাক্যই একমাত্র কাব্য। কাব্যের পরে পাঠকের যাবতীয় লোভ ঐ আনন্দটুকুর ওপর।

ভারতীয় আলংকারিকগণ মানবচিত্তের অসংখ্য ভাবের মধ্যে নয়টি ভাবকে প্রধান বা স্থায়ীভাবরূপে চিহ্নিত করে এই ন'টি ভাবের নয়টি রসরূপ প্রাপ্তির কথা বলেছেন। এই নয়টি স্থায়ীভাব ও তাদের রসরূপগুলি হল- রতিভাব-শৃঙ্গাররস, হাসভাব- হাস্যরস, শোকভাব- করুণরস, ক্রোধভাব-রৌদ্ররস, উৎসাহভাব-বীররস, ভয়ভাব- ভয়ানকরস, জুগুপ্সাভাব-বীভৎসরস, বিস্ময়ভাব- অদ্ভুতরস, শমভাব-শান্তরস। এই প্রধান ভাবগুলোর রসপরিণতীতে মোটামুটি তেত্রিশটি মত গৌণভাব সহযোগিতা করে থাকে। এই গৌণভাবগুলিকে অলংকারশাস্ত্রে 'সঞ্চারীভাব' বা 'ব্যাভিচারিভাব' বলে। আবেগ, ক্রোধ ধৃতি, অসুয়া ইত্যাদি তেত্রিশটি গৌণভাবকে ব্যাভিচারিভাবরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে।

স্থায়ীভাব ও সঞ্চারীভাব যেমন রসচর্বণার আন্তরিক উপাদান ঠিক তেমনই রসাস্বাদের বাহ্য উপাদান হল বিভাব ও অনুভাব। বিভাবকে রসানুভূতির 'কারণ' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ভরত বলেছেন—

বিভাব: কারণং নিমিত্ত হেতুরিতি পর্যায়াঃ
বিভাব্যন্তে অনেন বাগঙ্গসত্ত্বাভিনয়া ইতি বিভাবঃ। ['নাট্যশাস্ত্র']

অর্থাৎ, বিভাব হল রস উদবোধনের কারণ, হেতু, নিমিত্ত ইত্যাদি পর্যায়ভুক্ত। বিভাবের দ্বারা আঙ্গিক ও সাত্ত্বিক অভিনয় জ্ঞাপিত হয়। তবে এই কারণ নিমিত্ত বিভাব একান্তভাবেই কাব্যিক বা শিল্প-সাহিত্যকেন্দ্রিক। বাস্তব জগতে যে সমস্ত কারণে ভয়, শোক, ক্রোধ প্রভৃতি স্থায়ীভাবের সৃষ্টি হয় সেই লৌকিক কারণগুলি কিন্তু কিছুতেই বিভাব নয়। বিভাব একান্তই শিল্প-সাহিত্যগত অলৌকিক কারণ। সমালোচক বিভাবের এই আ-লৌকিক ধর্মের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে লিখেছেন- "পৃথিবীতে রতি, শোক, প্রভৃতি স্থায়ীভাবের যাহারা কারণ তাহারা যখন কাব্যে ও নাট্যে প্রবেশ লাভ করে তখন লৌকিক 'কারণ' সংঘা পরিত্যাগ করিয়া অলৌকিক 'বিভাব' আখ্যালাভ করে।"[৩] আলংকারিক বিশ্বনাথও জানিয়েছেন—

রত্যাদুদবোধকা লোকে বিভাবাঃ কাব্যনাট্যয়োঃ।। ['সাহিত্যদর্পণ', ৩।৩৩]

অর্থাৎ, লৌকিক জগতে যা রতি ইত্যাদি (স্থায়ী) ভাবের উদ্বোধক, তা কাব্য ও নাটকে নিবেদিত হলে তাকেই বিভাব বলে।

এই বিভাবরূপ কাব্যকারণের দুটি ভাগ-আলম্বনবিভাব ও উদ্দীপনবিভাব। কাব্য-নাটকের নায়ক-নায়িকা বা পাত্র-পাত্রী হল আলম্বনবিভাব। আর উদ্দীপনবিভাব হল আলম্বনবিভাবের পরিপোষক - যেমন বিজনবন, নদীতীর, বর্ষাঋতু ইত্যাদি যে প্রেক্ষিতে আলম্বন বিভাব প্রতিষ্টা পায় তাই-ই উদ্দীপন বিভাব।

আর অনুভাব হল,মনে ভাব উৎপত্তি হলে যে সমস্ত বিকার বা উপায়ে তা বাইরে প্রকাশ প্রায় সেই সমস্ত চিহ্ন বা লক্ষণ। এককথায়, অনুভাব হল নাটকের পাত্র-পাত্রীর অভিনয়। এই অভিনয় আঙ্গিক, বাচিক ও সাত্ত্বিক এই ত্রয়ী অভিব্যক্তির দ্বারা প্রকাশিত হয়। দুস্মন্তের মৃগয়া ত্যাগ, কৃশতা, চঞ্চল চক্ষু, অসংলগ্ন উক্তি, ইত্যাদি রতিভাবের কার্য প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে দুস্মন্তের হৃদয়ের প্রেমভাব ফুটে ওঠে। বিভাবের এই সব কাব্যময় উপস্থাপনই **'শকুন্তলা'** নাটকের অনুভাব। কাব্যের বিভাব, অনুভাবের সাহায্যে স্থায়ী ভাবের রসপরিণতীর পদ্ধতিটির চমৎকার ব্যাখ্যা দান করেছেন অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী তাঁর 'অলংকারচন্দ্রিকা' গ্রন্থে। ব্যাখ্যাটি উদ্ধার করলাম—

> *"কাব্যের উপাদান শব্দ। এই শব্দের উপাদানে কবি নির্ম্মাণ করেন বিভাব অনুভাব যথাযোগ্যরূপে তাঁর অভিপ্রেত স্থায়িভাবের অনুগত করে। পাঠক যখন এই কাব্য পাঠ করেন, তখন প্রথমে হয় এই বিভাব অনুভাবের অর্থবোধ। তারপর, পাঠক যদি সহৃদয় হন, এই অর্থবোধ থেকে হৃদয়সংবাদের দ্বারা তাঁর চিত্তে কাব্যের স্থায়ীর সজাতীয় স্থায়ীর উদ্বোধন হয়। এই উদ্বোধনের ফলে কাব্যের বিভাব অনুভাব পাঠকের আত্মচিত্তের সঙ্গে সংযোজিত হওয়ায় নবীভূত, অতএব সুন্দর হয়ে ওঠে। এই অভিনব সুন্দর বিভাব অনুভাব পাঠকের চিত্তে জন্মান্তরনিবিষ্ট সংস্কাররূপ বাসনাকে করে রঞ্জিত। সুন্দর বিভাব অনুভাবে রঞ্জিত এই বাসনা পাঠকের স্ব-সংবিৎকে অনু-রঞ্জিত করে তাকে করে তোলে সুকুমার। রস একটা সংবিৎমাত্র, তাই সংবিৎ আর আনন্দ অভিন্ন। কিন্তু এখানে সংবিৎ বিভাবানুভাবরঞ্জিত বাসনার অনুরঞ্জনে সুকুমার বলে আনন্দও বিশিষ্ট (absolute নয় qualified) এই বিশিষ্ট আনন্দসংবিৎ-এর যে চর্ব্বণাব্যাপার, এর দ্বারা রসনীয় অর্থাৎ স্বাদযোগ্য যে রূপ, তার নাম রস।.... যাকে বলা হয়েছে পাঠকের 'স্বসংবিদানন্দচর্ব্বণাব্যাপার' আসলে সে এই-বিভাব অনুভাবে রঞ্জিত (পাঠকের) বাসনা মানে তাঁর নিজস্ব স্থায়ী। এই স্থায়ীর অনুরঞ্জনে সুকুমার পাঠকের স্বসংবিৎ। স্থায়ি-অনুরঞ্জিত মধুর সংবিৎই সংবিদানন্দ। বড়ো বড়ো দার্শনিক পরিভাষা বাদ দিলে সহজ বোধ্য সারতত্ত্ব যা পাওয়া যায়, তা হল এই যে পাঠকচিত্তে অভিব্যক্ত তাঁর নিজস্ব যে স্থায়ী ভাব, তারই প্রতীতিই রস। ধ্বন্যালোকে প্রতীতি, রসনা, চর্ব্বনা, আস্বাদন একই অর্থে বিভিন্ন স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে।"* [৪]

।৩।

শাক্তপদাবলীর রসতত্ত্ব গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসতত্ত্বের অনুসারী। বলাবাহুল্য উত্তর চৈতন্যকালে ভারতীয় **'রসবাদ'** এক লোকোত্তর মহিমা প্রাপ্ত হয়েছে গৌড়ীয় রসতাত্ত্বিক মহাজনগণের সিদ্ধান্তে। ভারতীয় রসবাদ গৌড়ীয় ভক্তিবাদের বেদীতে নবরূপ প্রাপ্ত হয়েছে। আলংকারিক নবরসের জায়গা নিয়েছে **'ভক্তিরস'**। ভারতীয় রসবাদের এমন লোকোত্তর মহিমান্বিত রূপগ্রহণ প্রসঙ্গে আলোচক লিখেছেন- "সংস্কৃত আলংকারিকগণ যখন এইভাবে পার্থিব সাহিত্য বিষয়ক রসোদ্বোধ লইয়া আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন, তখন চৈতন্যোত্তর যুগের বাঙালী সমালোচকেরা রসকে আধ্যাত্ত্বিক জগতে সঞ্চারিত করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। চৈতন্যের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া এই ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম অগ্রসর হন রূপগোস্বামী। শ্রীরূপ তাঁহার **'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'** গ্রন্থে ভক্তিবাদকে রসবাদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে ভক্তিরসই একমাত্র রস অন্য রসগুলি ইহারই অবান্তর ভেদমাত্র।"[৫] লৌকিক অলংকারশাস্ত্রে ভক্তিরসের স্থান নেই।সেই ভক্তিকেই বৈষ্ণবমহাজনগণ সার জেনেছেন। বৈষ্ণবের ভক্তি কৃষ্ণ সম্বন্ধীয়-ঐশ্বরিক- 'সা

পরানুরক্তিরীশ্বরে'। এই ভক্তি কৃষ্ণের ঐশ্বর্যবোধহীন। প্রিয়তা এর স্বরূপলক্ষণ। বৈষ্ণব ভক্তের 'রাগ' বা 'রতি' একটিমাত্র- 'কৃষ্ণানুরাগ' বা 'কৃষ্ণরতি' (প্রিয়বস্তুর প্রতি আকর্ষণ রতি)। এই 'কৃষ্ণরতি' সাধারণভাবের থেকে পৃথক বস্তু-সম্পূর্ণ অ-লৌকিক।বৈষ্ণব রসতত্ত্বের প্রসিদ্ধ গবেষক ক্ষুদিরাম দাস সাধারণ রসের অলৌকিকত্ত্ব এবং বৈষ্ণবীয় ভক্তিরসের অ-লৌকিকত্ব সম্পর্কে সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর 'বৈষ্ণব-রস প্রকাশ' গ্রন্থে। লিখেছেন- "লৌকিক কাব্যশাস্ত্রে ভাবমাত্রই লৌকিক, আর বিভাব এবং অনুভাব সঞ্চারীমিশ্র বিভাবের সহায়তায় ভাবের যে আনন্দাত্মক পরিণাম কেবল তাই-ই অলৌকিক। আবার এ 'অলৌকিক' এবং কৃষ্ণরতির অলৌকিক সমার্থকও নয়। কাব্যরসের অলৌকিক অপ্রাকৃত নয়, অ-লৌকিক অর্থাৎ লৌকিক কার্য-কারণ জন্য-জনক প্রভৃতি সম্বন্ধ বোধের অযোগ্য। রসাভিব্যক্তির ব্যাপারগুলিকে লৌকিক প্রমাণের দ্বারা ধরা যায় না, অনুভবেই তার সত্যতার একমাত্র লক্ষ্য, তাই অলৌকিক। আর বৈষ্ণবের অলৌকিক হল যা লৌকিক বা মায়িক জগতের নয়, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক। শব্দদুটি এক হলেও এদের বাচকত্ব পৃথক।"[৫]

কায়-বাক্-চিত্ত কৃষ্ণে সমর্পিত হলে তবেই ভক্তিভাব উদিত হয়। জ্ঞান কর্ম বৈরাগ্যের লেশমাত্র থাকে না। 'রাগাত্মিকা' এবং 'রাগানুগা' এই দ্বিবিধ পন্থায় বৈষ্ণবীয় কৃষ্ণরতি ধারা প্রবাহিত। ভক্তভেদে এই কৃষ্ণরতির আবার পাঁচটি ভাগ-শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি, বাৎসল্যরতি এবং মধুরকরতি। বৈষ্ণবীয় 'ভক্তিরস' তাই পঞ্চ-প্রকার-শান্তরস, দাস্যরস, সখ্যরস, বাৎসল্যরস, ও মধুররস। ভগবান পাঁচ প্রকারের সাধনাতে প্রীত হন। বৈষ্ণবপদাবলি এই পঞ্চরসের কবিতা। ভারতীয় কাব্যজিজ্ঞাসায় বৈষ্ণবীয় রস ব্যাখ্যায় এভাবেই Art for Art's Sake এর পাশাপাশি Art for soul sake-এর তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। ভারতীয় রসবাদের এমন লোকোত্তর মহিমান্বিত রূপগ্রহণ প্রসঙ্গে আলোচক লিখেছেন- "সংস্কৃত আলংকারিকগণ যখন এইভাবে পার্থিব সাহিত্য বিষয়ক রসোদ্বোধ লইয়া আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন, তখন চৈতন্যোত্তর যুগের বাঙালী সমালোচকেরা রসকে আধ্যাত্ত্বিক জগতে সঞ্চারিত করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। চৈতন্যের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া এই ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম অগ্রসর হন রূপগোস্বামী। শ্রীরূপ তাঁহার **'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'** গ্রন্থে ভক্তিবাদকে রসবাদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে ভক্তিরসই একমাত্র রস অন্য রসগুলি ইহারই অবান্তর ভেদমাত্র।"[৬]

তবে শাক্তদর্শন এবং শাক্ত-সাহিত্যের প্রসঙ্গে কোনও স্বতন্ত্র রসশাস্ত্র গড়ে উঠেনি। পরবর্তী শাক্ত-সাহিত্যর রসবিচার প্রসঙ্গে যা কিছু আলোচনা হয়েছে তা মূলত বৈষ্ণব রসশাস্ত্রকে সামনে রেখে। শাক্তশাস্ত্রেও মূল ভক্তিরসকে আশ্রয় করে তার পাঁচটি রসরূপ কল্পিত হয়েছে যথা বাৎসল্য, বীর, অদ্ভুত, দিব্য ও শান্ত। এই প্রসঙ্গে ড. সুধীর কুমার দাশগুপ্তের বিবেচনা একেবারে যথার্থ। তাঁর 'কাব্যালোক' গ্রন্থে বলেছেন- "বৈষ্ণব পদাবলীর ন্যায় শাক্তপদাবলীরও আলম্বন ভক্তিরস। এই ভক্তিরস নানা ভাবের অধিবাসনে বাৎসল্য, বীর, অদ্ভুত, দিব্য ও শান্ত এই পঞ্চমুখ্য রসে উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। শাক্তসাধকগণের ভক্তিভাব হইতেছে দিব্য মাতৃভাব বা মাতৃমহাভাব।"[৭] বস্তুত, শাক্তসাধক বা শাক্ত-সাধককবিগণ মাতৃভক্তিকেই জীবনের সার করেছিলেন। যে চিন্ময়ী মহাশক্তিময়ীকে শাক্তসাধক জগৎ ও জীবনের মূলীভূত শক্তিরূপে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সর্বভূতেশ্বরী রূপে প্রণতি জানিয়েছেন—

যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা। *['শ্রীশ্রীচণ্ডী']*

বলে, সেই আদিভূতাসনাতনী অদ্যাশক্তি মহামায়াকে আবার প্রত্যক্ষ করেছেন আপনার মায়ের পূজনীয় বেদীতে। শাক্তকবির কথায় সুরে গানে চিন্ময়ী রসেশ্বরীর মৃন্ময়ী মাতৃরূপ প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে, বড়ো হয়ে ওঠে মায়ের প্রতি সন্তানের অনাবিল প্রেম-প্রীতি ভালোবাসা। শাক্তগানের পরতে পরতে জড়িয়ে আছে বিশ্বময়ীর সঙ্গে সাধকবির এই 'আমি-তুমি'র লীলাচাঞ্চল্য। বস্তুত, বাঙালির চিন্তা-চৈতন্য-সংস্কারে মাতৃপ্রাণতার এমনই মহান ঐতিহ্য। বাঙালির এই মাতৃপ্রাণতার পথিকৃত বোধ হয় রামপ্রসাদ কমলাকান্তের মতো শাক্তকবিরা। আলোচক লিখেছেন- "এই মাতৃভাবের অতি মহনীয় প্রকাশ হইয়াছে সিদ্ধ কবি রামপ্রসাদের কবিতায়। ... 'মা' এই ডাক রাম প্রসাদের কণ্ঠে এক সিদ্ধমন্ত্রের শক্তিতে মহিমময় হইয়া উঠিয়াছে।" [৮] শাক্তকবিই দেখিয়েছেন যে ব্যাকুল ভাবে 'মা' বলে ডাকতে পারলে; নিঃশর্তে

ব্রহ্মময়ীর চরণে আপনাকে সঁপে দিতে পারলে; তবে তিনি সন্তানের সমস্ত দু:খ কষ্ঠের দায় নেন; পরম মমতায় ঘরের বেড়া বেঁধে দেন। শাক্তপদাবলির পঞ্চরস যেন সেই বিশ্বময়ীর চরণে নিবেদিত শাক্তসাধকের পঞ্চ উপাচারে সজ্জিত গীতরূপ নৈবেদ্য।

'বাৎসল্যরসের' গান:

'বৎসলতা' স্থায়ী ভাবের রসরূপ 'বাৎসল্যরস'। এই বাৎসল্য আবার আলম্বনভেদে দু'ধরনের-'বাৎসল্য' এবং 'প্রতিবাৎসল্য'। পিতামাতার সন্তানের প্রতি যে বৎসলতা তা 'বাৎসল্য'। আর সন্তানের পিতা মাতার প্রতি বৎসলতা 'প্রতিবাৎসল্য'। অনেকে আবার বাৎসল্য এবং বাৎল্যরসের ত্রবিধ বিভাগ নির্দেশ করেন। যেমন বাৎসল্য, মিলন বাৎসল্য, বিরহ বাৎসল্য।[৯] ভরত প্রমুখ প্রাচিন আলংকারিকেরা 'বাৎসল্যরস'-কে রস হিসাবে স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠা দেখালেও বলরাম দাস, যাদবেন্দ্র, রায়শেখর প্রমুখ বৈষ্ণব কবিগণ যেমন বাৎসল্যরসের অমৃত ধারায় স্নান সেরেছেন, তেমনই রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, গিরিশ ঘোষ, মধুসূদন, নবীনচন্দ্র, নজরুল ইসলাম প্রমুখ শক্তিকবিগণ সেই 'পিযুষ পয়োধারা' পান করতে চেয়েছেন আকণ্ঠ। বলবাহুল্য, বাৎসল্যরসই শাক্তপদাবলির প্রধান রস। লীলাপর্যায়ের বাল্যলীলা, আগমণ, বিজয়ার গানে এই বাৎসল্য রস যেমন উমা গিরিরাজ ও মেনকার প্রতীকে উচ্ছ্বলিত হয়েছে, শ্যামাসংগীতগুলোতে তেমনই ব্রহ্মময়ী এবং সন্তানতুল্য কবি-র আবেদন, নিবেদন; আদর, সোহাগ, অভিমানের মধ্য দিয়ে মায়া-মমতা-স্নেহের ঝর্নাধারা হয়ে বয়ে গেছে।

বাৎসল্য ভুবনের তিন বাসিন্দা- উমা, মেনকা ও গিরিরাজ। উমার জন্ম-বাল্যকাল-বিবাহ (গৌরীদান)-পিতৃগৃহে আগমন বিজয়া ইত্যাদি মানবিক ঘটনা ও কাহিনীর পরম্পরায় বাৎসল্যের মানবিক মুখটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। রামপ্রসাদ কমলাকান্তের মতো মহাপ্রতিভাধর শাক্তসাধককবিগণ তাঁদের প্রতিভা নিঃশেষে উজার করে দিয়েছন বাৎসল্যের গানে। আলোচক যর্থাথই লিখেছেন-"বাৎসল্যরস পরিস্ফূট মা মেনকা ও ছোটমেয়ে উমার মধ্যে মিলন বাৎসল্য প্রকাশ পাইয়াছে। উমা হরের ঘরনী হইবার পর আগমনী গানে, এবং বিরহ-বাৎসল্য বিজয়া গানে। এই আগামনী বিজয়া গানের মধ্যে দিয়েই পদাবলীর সর্বজনীন আবেদন সর্বাধিক পরিমাণে অনুভূত হয়।"[১০]

যিনি পূর্ণব্রহ্মময়ী, যিনি সর্বভূতশ্বরী, যিনি ত্রিগুণের কারণ এবং ত্রিগুণাতিতা, যিনি সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কারণভূতা, যিনি সর্ব আনন্দের উৎসার আনন্দময়ী সেই মহাচৈতন্যের আধার চৈতন্যরূপিণী সুকঠিন স্নেহের টানে গিরিরাজ হিমালয় এবং মেনকার ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। উমারূপে মেনকার কোল আলো করে সমগ্র গিরিপুর আনন্দে ভরিয়ে দেন- এই পৌরণিক কাহিনির মানবিক পাঠ উচ্ছ্বলিত হয়েছে বাল্যলীলার গানে।

উমা সামান্য মেয়ে নয় তা মেনকা অনুভব করেছেন স্বপ্নদর্শনে। চতুর্ভুজ নারায়ণ, পক্ষমুখ শিব সকল দেবতাই তাঁকে মাথায় করে রাখেন। তিনি স্বপ্নে দেখেছেন গড়ুর বাহন-নারায়ণ যোড় হাতে তাঁর কাছে বিনয় প্রার্থনা করছেন।"মুনিগণে ধ্যানে যাঁরে না পায়" এইপরমারধ্যাকেই তিনি কন্যারূপে গর্ভধারণ করেছেন—

তুমি ধন্য গিরি! হেন কন্যা পেয়েছ কি পূণ্য উদয়। [রামপ্রসাদ]

এহেন কন্যাকে নিয়ে মেনকার ব্যস্ততার অন্ত নেই। মেয়ে কথায় কথায় অভিমান করে। অসম্ভব সব বায়না ধরে। কিছুতেই স্তন্যপান করতে চায় না,এমনই দুরন্ত-এমনই চঞ্চলা গিরিবালা—

উমা কেঁদে করে অভিমান নাহি করে স্তন্যপান
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে।।
অবশেষ নিশি গগনে উদয় শশী
বলে উমা ধরে দে উহারে। [রামপ্রসাদ]

শেষে তার সামনে আয়না ধরলে তবে সে শান্ত হয়—

মুকুরে হেরিয়া মুখ উপজিল মহাসুখ
বিনিন্দিত কোটি শশধরে। [রামপ্রসাদ]

মায়ের আদরে, বাপের সোহাগে, পাড়াপ্রতিবেশীদের ভালোবাসা গায়ে মেখে বালিকা উমা ক্রমে অষ্টম বর্ষে পা দিলেন। সমাজনীতি মেনে তাঁর বিবাহের তোড়জোড় চলতে লাগলো। শেষে নারদের পরামর্শে দেবাদিবের সঙ্গেই উমার বিবাহের ব্যবস্থা পাকা করলেন গিরিরাজ। কিন্তু এই অসমবর্ষীয় বিবাহে বাদ সাধলেন মেনকা। বৃদ্ধ মহাদেবকে জামাই হিসেবে মেনে নিতে ক্ষোভে ফেটে পরলেন তিনি। শিব একে বয়োবৃদ্ধ তার উপর বিত্তহীন-ভিখারি। নেশাখোর। শ্মশানে-মশানে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু বিধির বিধানে এবং উমার জেদে শেষ পর্যন্ত উমা শিবঘরণী হয়ে কৈলাসে চলে গেলেন। বছরে মাত্র তিনদিনের জন্য বাপের বাড়িতে আসেন। মেনকার কাছে এই দিনগুলো পরম আনন্দের দিন হয়ে দেখা দেয়। উমার আগমনে বাংলার ঘরে ঘরে, বাংলার আকাশে বাতাশে প্রকৃতিতে আনন্দময়ীকে বরণের বার্তা রটে যায়। আগমনীর সুর বেজে ওঠে বাউলের একতারাতে। শাক্তপদাবলির আগমনী পর্যায়ের গানগুলিতে উমা-শিব-মেনকা-গিরিরাজ-বাংলার প্রকৃতি ইত্যাদির প্রতীক্ষা-ব্যাকুলতায় কন্যা বাৎসল্যের রসধারা উদ্বেল হয়েছে। আর বিজয়ার গানে উমার শিবগৃহে যাত্রাকে অবলম্বন করে মা মেনকা-গিরিরাজ এবং বাংলাদেশের ও বাঙালির মর্মস্পর্শী বিদায় ব্যথার করুণ দীর্ঘশ্বাস উচ্চারিত হয়েছে। আগমনী ও বিজয়ার গানে পৌরাণিক উমাকাহিনীর নবরূপায়ণ ঘটে গেছে। বাল্য-বিবাহ তথা গৌরীদানপ্রথা, কৌলিন্যপ্রথা, পণপ্রথা, বহুবিবাহ প্রথা প্রভৃতি বিভিন্ন কু-প্রথায় জীর্ণ বাঙালি এবং বাংলার সমাজ সংস্কৃতি রীতি-নীতি বিশ্বাসের সংযোজনে পৌরাণিক উমাকাহিনিকে শাক্তকবি বাঙালি গৃহস্থের আঁতেরকথা এবং প্রাণের ব্যাথায় পরিণত করেছেন। পুরাতন দেবকাহিনি শাক্তকবির কণ্ঠে মাতা-পিতা-কন্যার মধ্যে উচ্ছ্বলিত চিরন্তন মানবকাহিনি তথা চিরশাশ্বত বাৎসল্যের ভাষ্য হয়ে উঠেছে। আলোচক যথার্থ বলেছেন- "বাঙ্গালীর মতন 'মা' বলিয়া-ডাকিতে পৃথিবীর আর-কোন জাতি পারে নাই-বুঝি বা পারিবেও না। মাকে মেয়ে সাজাইয়া যে সব খেলা এদেশের ভক্ত ও সাধকেরা খেলিয়াছে, তাহার নিদর্শন অন্য কোথাও দৃষ্ট হয় না। তাই আগমনী ও বিজয়ার গান কেবল বাঙ্গালীই রচনা করিতে পারিয়াছে, আর কোনোও জাতি পারে নাই। বাঙ্গালীর ভাষা ভান্ডারের ইহা এক অমূল্য সম্পদ"।[১১] যে বাঙালি আপনার হৃদয় মথিত অমৃত দ্বারা নিমাই মূর্তি তৈরি করে বিশ্বের দরবারে প্রেমের ললিত বাণী শুনিয়েছেন সেই বাঙালিই বিশ্বময়ী বিশ্বজননীকে আপন কন্যা এবং মাতা জ্ঞানে আপনার মাটির ঘরে মৃন্ময়ীর বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করে 'আমি-তুমি'-র বাৎসল্যের লীলাখেলায় মত্ত হয়েছেন। দৈবীভাবকে আশ্রয় করে এ এক অনির্বচনীয় মানব রসের উদ্ভাসন; এ এক মহাকাব্যিক রস ব্যঞ্চনার আস্বাদ। আগমনী বিজয়ার গানে মানুষের হৃদয়গত ভাবের এমন রস পরিণতী নিতান্তই দুর্লভ।

মেনকা শুনেছেন হরের ঘরে উমা দুঃখে আছেন। মেয়ের দুঃখের কথা শুনে অবধি মেনকার দিন রাত্রিতে বিষ মিশে গেছে। রাত্রে ঘুম নেই। দুঃস্বপ্ন দেখেন—

কুস্বপন দেখেছি গিরি, উমা আমার শ্মশানবাসী। [গিরিশচন্দ্র ঘোষ]

ঘুম ভেঙে যায় মেনকার। কন্যামুখ দর্শনের জন্য অধীর হয়ে ওঠেন—

কবে যাবে বল গিরিরাজ, গৌরীরে আনিত
ব্যাকুল হৈয়েছে প্রাণ উমারে দেখিতে হে। [কমলাকান্ত]

গিরিবর পাষাণ-হৃদয়। মেনকার মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতা তিনি বুঝতে চান না। তাই নিয়ে মেনকার অনুযোগের অন্ত নেই-

এমন মেয়ে কারে দিয়ে হয়েছে পাষাণ। [ইশ্বরচন্দ্র গুপ্ত]
গৌরী দিয়ে দিগম্বরে আনন্দে রয়েছ ঘরে। [কমলাকান্ত]

ইত্যাদি বলে গিরিরাজকে গাল পারেন। শেষ পর্যন্ত এক সময় প্রতিজ্ঞা করে বসেন যে, এবার উমা এলে আর তিনি উমাকে কৈলাসে পাঠাবেন না—

গিরি, এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না।
বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনবো না।
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয় উমা নেবার কথা কয়
এবার মায়ে ঝিয়ে করবো ঝগড়া জামাই বলে মানব না। *[রামপ্রসাদ]*

উমাকে আশ্রয় করে মেনকার এইসব উক্তি; হৃদয় বেদনার উচ্ছ্বাস, আক্ষেপ-বিলাপ চিরন্তন মায়ের চিরন্তন সন্তান বাৎসল্যের অসাধারণ বাণীশিল্প হয়ে উঠেছে।

মেনকা গিরিরাজকে বারাবার কন্যা আনবার তত্ত্বকথা মনে করিয়ে দেন যাতে করে জামাইয়ের কোন অসম্মান না হয়—

শিবকে পূজবে বিল্বদলে সচন্দন আর গঙ্গাজলে,
ভুলবে ভোলার মন
অমনি সদয় হবেন সদানন্দ, আসতে দিবেন হারা তারাধন।
এনো কার্ত্তিক গণপতি, লক্ষ্মী সরস্বতী, ভগবতী এনো মস্তকে করে
জামাই যদি আসেন, এনো সমাদর করে। *[রাম বসু]*

সারা গিরিপুর জুড়ে আনন্দের সাড়া পড়ে গেছে। উমা বরণের আয়োজন চলতে থাকে সাড়ম্বরে—

নগর-রমনী উলু উলু ধ্বনি আনন্দে দিচ্ছে বারে বারে। *[কমলাকান্ত]*
চল, বরণ করিয়া গৃহে আনি গিয়া- *[রামপ্রসাদ]*

বলে নগরবাসী ছুটে চলে নগরদ্বারের দিকে। মেনকাও ছুটে চলেন তাদের সঙ্গে কন্যাবরণের জন্য—

আমার উমা এলো বলে রানী এলো কেশে ধায়। *[কমলাকান্ত]*

দু হাত বাড়িয়ে দেন কন্যায় দিকে, তৃষিত মাতৃহৃদয় শান্ত হতে চায় কন্যাকে বক্ষে জড়িয়ে ধরে—

উমা গো যদি দয়া করে হিমপুরে এলি আয় মা করি কোলে।
বর্ষাবধি হারায়ে তোরে, শোকের পাষাণ বক্ষে ধরে আছি শূন্য ঘরে
কেবল মরি নাই মা বেঁচে আছি দুর্গা নাম কোরে।
এক বার আয় মা বক্ষে ধরি, পুত্রশোক নিবারি,
চাঁদ মুখে শঙ্করী, ডাক 'মা'বোলে। *[উদয়চাঁদ বৈরাগী]*

মেয়েকে কোলে বসিয়ে আদরে আদরে ভরিয়ে দেন মেনকা; মুখচুম্বনে ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন; হাজারো প্রশ্নে চকিত করে তোলেন উমাকে—

কেমনে মা ভুলেছিলি এ দুঃখিনী মায়?
পাষাণ নন্দিনী তুইও কি পাষাণীর প্রায়?
সম্বৎসর হলো গত, তোর বিরহে অবিরত
কেঁদেছি কহিব কত, আমি মা তোমায়। *[রাজকৃষ্ণ ঘোষ]*

মাতা পুত্রীর এই মিলন বাস্তবিক স্বর্গীয় সুষমামন্ডিত। আমাদের প্রতি দিনের ধূলি-ধূসরিত পৃথিবীর ঘরে ঘরে চোখ পাতলে যে চির অমলিত দৃশ্যটি আমাদের মুগ্ধ করে তা এই মিলন বাৎসল্য। শাক্তকবির লেখনি মিলন বাৎসল্যের সেই চির সৌন্দর্যের দৃশ্যটিকে কথায়, সুরে, তালে অমরত্ব দান করে গেছে।

দেখতে দেখতে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী দিনগুলো পেরিয়ে যায়। নেমে আসে নবমীনিশি।বিচ্ছেদের কালরাত্রি। রাত্র পোহালেই উমা বিদায় নেবেন। আসন্ন বিচ্ছেদ বেদনায় মেনকার অন্তর হাহাকার করে ওঠে। নবমী নিশির কাছে প্রার্থনা জানান যেন এই রাত শেষ না হয়—

ওরে নবমী নিশী না হইরে অবসান। *[কমলাকান্ত]*
যেও না রজনী আছি লয়ে তারা দলে।
গেলে তুমি দয়াময়ী এ পরাণ যাবে। *[মধুসূদন দত্ত]*

শেষপন্তি তাও 'দারুণ' নবমী নিশি পোহায়। দরজায় শোনা যায় মহাকালের ডমরুধ্বনি। অবুঝ মাতৃহৃদয় বলে উঠে -উমার বিনিময়ে তিনি শিবকে সব কিছু দিতে পারেন; প্রাণ পর্যন্ত দান করতে পারেন, শুধুমাত্র উমাকে দিতে পারবেন না। সংসারের এই রীতি রেওয়াজকে তিনি গালি পাড়েন। সখী বিজয়াকে বলে দেন যে, সে যেন হরকে বলে দেয় যে উমাকে পাঠানো যাবে না—

জয়া বল গো পাঠান হবে না
হর মায়ের বেদন কেমন জানে না। *[কমলাকান্ত]*

তবুও উমাকে বিদায় দিতে হয়। পথ ছেড়ে দাঁড়াতে হয় কন্যার। শেষ বারের মতো কন্যামুখ দর্শন করতে চান, উমাকে পথের মধ্যে দাঁড় করিতে দেন মেনকা—

ফিরে চাও গো উমা বিধুমুখ হেরি। *[কমলাকান্ত]*
এইখানে দাঁড়াও উমা, বারেক দাঁড়াও মা। *[কমলাকান্ত]*

কন্যার কাছে আবার আসবার প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেন—

এস মা, এস মা উমা, বলো না আর 'যাই,' 'যাই'।
মায়ের কাছে হৈমন্তী ও কথা মা বলতে নাই। *[জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়]*
দুটি নয়ন মোর রইল চেয়ে পথ পানে
বোলে যাও, আসিবে আর কতদিনে এ ভবনে। *[কমলাকান্ত]*

উমা চলে যান। মেনকা ঘরে ঘিরে আসেন। ঘরের অন্ধকার আজ তাঁর কাছে বড়ো বেশি জমাট জামাট লাগে—

"রতন ভবন মোর আজি হৈল অন্ধকার"। *[কমলাকান্ত]*

বিরহ বাৎসল্যের এমন মর্মস্পর্শী নিবেদন শুধুমাত্র বাংলা সাহিত্যে কেন বিশ্বসাহিত্যেও খুঁজে পাওয়া ভার।

পিতামাতার প্রতি সন্তানের বাৎসল্য প্রতিবাৎসল্য। এই বাৎসল্য প্রকাশিত হয় পিতা মাতার প্রতি সন্তানের প্রেম প্রীতি রাগ অনুরাগে। লীলাপর্বের উমার জবানিতে উচ্চারিত গানগুলো প্রতিবাৎসল্যের গান। কমলাকান্তের "শরৎ কমল মুখে, আধ আধ বাণী মায়ের", অম্বিকাচরণ গুপ্তের "ছিলাম ভাল জননি গো হরেরি ঘরে" ইত্যাদি গানগুলোতে প্রতিবাৎসল্যের সুর ধ্বনিত হয়েছে। এছাড়াও ভক্তের আকুতি, চরণতীর্থ, মনোদীক্ষা প্রভৃতি পর্যায়ের বেশ কিছু গানে যেখানে কবি আপনাকে বিশ্বমাতার সন্তান জ্ঞানে আনন্দময়ীর সঙ্গে মান-অভিমান, আবদার-অনুরাগের লীলা খেলায় মত্ত হয়েছেন, সেই জাতীয় গানে প্রতিবাৎসল্যরসের উৎসার ঘটেছে। যেমন—

ওমা মুন্ডমালী, আমায় কি ভাব দেখাইলি।
'মা' বলতে 'মা' শিখাইয়ে, 'মা' বলতে মা মাতিয়ে দিলি
এমন সুধা ভরা নামটি তোমার বল্ মা তারা কোথায় পেলি।" *[রামপ্রসাদ]*
"মাগো তারা ও শঙ্করি,
কোন অবিচারে আমার পরে করলে দু:খের ডিগ্রী জারি? *[রামপ্রসাদ]*

প্রতিবাৎসল্যের গানে এই ভাবে ভক্তসাধকের তাবৎ হৃদয়ানুভূতি স্থান পেয়েছে। মাকে কেন্দ্র করে ভক্ত সন্তানের এই মানবিক উচ্চারণগুলি রসোতীর্ণ কাব্যের ব্যঞ্জনাবাহী সন্দেহ নেই।

'বীররসের' গান :

'উৎসাহ' স্থায়ীভাবের রসরূপ **'বীররস'**। বীররসের গানে জীবন মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করার একটা সাত্ত্বিক অহংকার প্রতিষ্ঠা পায়। আলোচকের ব্যাখ্যায়- "এই সকল কবিতার স্থায়ীভাব হইতেছে যুদ্ধোৎসাহ- পরম বিশ্বাস ও জ্ঞানরূপ অস্ত্র লইয়া মৃত্যু ভয় বা দুঃখ ভয়কে বিনাশ করার উৎসাহ, এই সমর রাজসিক নহে, সাত্ত্বিক। ইহা প্রকৃতপক্ষে **'**সাধন সমর।"[১২] রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রমুখের বেশ কিছু গানে এই বীররসের স্ফূরণ ঘটেছে।

প্রসাদীগান সতত উদাত্ত সুরে বাঁধা। জীবন মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে তোলার দু:সাহস তাঁর ছিল। নিজেকে **'**ব্রহ্মময়ীর বেটা**'** জ্ঞান করতেন। তাই যমের ভয় তাঁকে কখনও স্পর্শ করতে পারেনি। গানে ধরা পড়েছে তাঁর সেই নির্ভিক মানসিকতা—

দূর হয়ে যা যমের ভটা ওরে আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা।
বলগে যা তোর যম রাজারে আমার মত নেছে কটা।
আমি যমের যম হইতে পারি ভাবলে ব্রহ্মাময়ীর ছটা। *[রামপ্রসাদ]*

রামপ্রসাদের "এবার কালী তোমার খাব" গানটিও একটি অসাধারণ বীররসের গান। রসিকচন্দ্র রায়ের "আয় মা সাধন সমরে" গানটিতে বীরাচারী শাক্তসাধকের সাত্ত্বিক অহংকার প্রতিষ্ঠা পেয়েছে—

বারে বারে রণে তুমি দৈত্য জয়ী
এই বার আমার রণে এসো ব্রহ্মময়ী,
ভক্ত রসিকচন্দ্র বলে, মা তোমারি বলে, জিনবো তোমায়। *[রসিকচন্দ্র রায়]*

ধর্মবীর এবং কর্মবীর সন্ন্যাসীশ্রেষ্ঠ বিবেকানন্দের কবিতাতে ও কর্মসাধনায় এই বীরভাবের মহান প্রকাশ ঘটেছে। 'Kali the mother' কবিতায় তিনি পরম সাহসে **'**মৃত্যুরূপা মাতা**'** কালীকে বরণ করে দুঃখ জয় এবং মরণ ভয় নাশের কথা বলেছেন—

কালি, তুই প্রলয়রূপিনী, আয় মা গো আয় মোর পাশে।
সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহু পাশে,
কালনৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।
[Kali the mother-এর অনুবাদ 'মৃত্যুরূপা মাতা'- সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত]

এই যে শক্তিময়ীর আশির্বাদে শক্তিমান হয়ে ওঠা; এই যে প্রবল স্পর্ধা ভরে শক্তিময়ীর সঙ্গেই সমরায়োজন, এই যে মৃত্যুরূপাকে আপনার করে আলিঙ্গনের দুঃসাহস, বীররসের সাধনায় এবং গানে শাক্ত ভাব ঐশ্বর্যের এমনই মহান বিস্তার লক্ষ্য করা যায়। যে ঐশ্বর্যে ধনী সাধক অনায়াসে উচ্চারণ করতে পারে—

আমি কি দুখের ডরাই
দুঃখে দুঃখে জনম গেল, আর কত দুঃখ দেও দেখি তাই। *[রামপ্রসাদ]*

'অদ্ভুত রসের'-গান:

'বিস্ময়' স্থায়ীভাবের রসরূপ 'অদ্ভুতরস'। শাক্তপদাবলির 'জগজ্জননীর রূপ' পর্যায়ের গানগুলোতে এই অদ্ভুতরসের স্ফূরণ সবথেকে বেশি। কোমলে-কাঠিন্যে, সৌন্দর্যে-বিভৎসতায়, মাধুর্যে ও ভীষণত্বে শক্তিদেবীর স্বরূপটি অঙ্কিত। বস্তুত, একই আধারে এমন যুগপৎ বৈপরীত্যের সমাবেশ বিস্ময়ের বৈকি। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রমুখের গানে এই অদ্ভুতরসের উৎসরণ ঘটেছে স্বাভাবিক ভাবে। যেমন—

ও কে রে মনোমোহিনী-ঐ মনোমোহিনী
ঢল ঢল ঢল তড়িৎ-ঘটা, মনি-মরকত-কান্তিঝটা।
একি চিত্ত-ছলনা, দৈত্য-দলনা, ললনা-নলিন-বিড়ম্বিনী। *[রামপ্রসাদ]*

অথবা, *রঙ্গে নাচে রণ-মাঝে, কার কামিনী মুক্তকেশী।*
হৈয়ে দিগম্বরী, করে ধরে তীক্ষ্ণ অসি।
কে রে তিমির বরণী বামা, হৈয়ে নবীনা ষোড়শী।
গলে দোলে মুন্ডমাল, মুখে মৃদু মৃদু হাসি। *[কমলাকান্ত]*

এ এক অসাধারণ মাতৃরূপ। আলোচক লিখেছেন- "এই শক্তিমূর্তির রূপ দিতে পারে এমন মৃৎশিল্পী ও চিত্রশিল্পী আজও দুর্লভ। ইহা একান্তই দিব্যভক্তের আরাধনার ধন, সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারশক্তির অবিভিন্ন লীলার যেন যুগপৎ প্রত্যক্ষ প্রকাশ। এই রূপের অবলম্বন - ভূত রসকে অদ্ভুতরস ব্যতীত- আর কি বলা যাইতে পারে।"[১৩]

'দিব্যরসের' গান:

দিব্যভাবের রসরূপ 'দিব্যরস'। এই দিব্যভাব অলৌকিক এবং সাধনালব্ধভাব। পণ্ডিতের কথায়- "দিব্য শব্দের দ্বারা অলৌকিকত্ব এবং শুদ্ধত্ব বুঝাইতেছে। ইহা যে কামনামূলক বৈধীভক্তি বা সাংসারিক লোকের পার্থিব ভক্তি নয়, তাহাও বুঝাইতেছে।"[১৪] তন্ত্রে 'পশুভাব', 'বীরভাব' এবং 'দিব্যভাব'- এই ভাবত্রয়ের মধ্যে দিব্যভাবের সাধনাকে শ্রেষ্ঠ সাধনা বলা হয়েছে- "তন্ত্রে শ্রেষ্ঠ সাধকের নাম দিব্যসাধক, শ্রেষ্ঠভাবের নামও দিব্যভাব।"[১৫] অধ্যাপক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী তাঁর আলোচনায় দিব্যভাবের এই স্বরূপের সুন্দর ব্যখ্যা দিয়েছেনক- "এ এক পরম সাত্ত্বিকভাব। ইহার আচার আচরণ অতি সুন্দর। সিদ্ধ-যোগী বা ব্রহ্মজ্ঞানীর যে অবস্থা, দিব্যাচারী সাধক সেই অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার দেহ পবিত্র, হৃদয় স্বচ্ছ ও নির্মল, দৃষ্টি উদার, চরিত্র মহান।"[১৬] কৌলসাধনার শ্রেষ্ঠস্তর এই দিব্যস্তরে উন্নীত হয়ে ছিলেন রামপ্রসাদ কমলাকান্ত প্রমুখ শক্তিসাধক। জগৎ ও জীবনকে পুরুষ ও প্রকৃতির অদ্বৈতসত্তা জ্ঞান করেছিলেনতাঁরা। তাদের গানে দিব্যসাধনার এই তাত্ত্বিকতার রস ব্যঞ্জনা মূর্ত হয়ে উঠেছে। যেমন—

মজিল মন ভ্রমরা, কালীপদ নীলকমল।
যত বিষয় মধু তুচ্ছ হৈল, কামাদি কুসুম সকলে।
চরণ কালো ভ্রমর কালো কালোয় কালো মিশে গেল
দেখ, সুখ দুঃখ সমান হল আনন্দ-সাগর উথলে।। *[কমলাকান্ত]*

অথবা, *কালী হলি মা রাসবিহারী নটবর বেশে বৃন্দাবনে।* *[রামপ্রসাদ]*

অথবা, *কে জানে গো কালী কেমন!*
ষড়দর্শনে না পায় দরশন।।
কালী পদ্মবনে হংশ-সনে, হংসীরূপে করে রমন।।...
তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন। *[রামপ্রসাদ]*

ইত্যাদি গানগুলোতে দিব্যরসের স্ফূরণ ঘটেছে।

'শান্তরসের' গান:

শান্তরসের স্থায়ীভাব 'শম্'ভাব। 'শান্তরসের' স্বরূপ প্রসঙ্গে নাট্যাচার্য ভরত বলেছেন—

ন যত্র দুঃখং ন সুখং ন দ্বেষো নাপি মৎসরঃ।
সমঃ সবেষু ভূতেষু সঃ শান্তঃ প্রথিতো রসঃ।। *('নাট্যশাস্ত্র')*

অর্থাৎ, "যেখানে দু:খ নাই, সুখও নাই, দ্বেষ অথবা মাৎষর্য নাই, সর্বভূতে যাহা সমদৃষ্টি-স্বরূপ, তাহাই শান্ত-রস বলিয়া প্রসিদ্ধ।"[১৭] বিষয়-আশয় তুচ্ছ করে; যাবতীয় ভোগবাসনা পরিত্যাগ করে; পরমপ্রিয় ভগবানকে পরম ঐশ্বর্যময় ও নিত্যস্বরূপ জ্ঞানে ভক্ত যখন নিঃশর্তে ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করেন তখনই শান্তরসের সাধনা হয়। রবীন্দ্রনাথের গানে আছে—

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণ ধূলার তলে।
সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে। *['গীতাঞ্জলি']*

শান্তরসের গান এমনই আত্মনিবেদনের গান। নিবেদনের গানে বা প্রার্থনা সংগীতে সাধকের আধ্যাত্মিক চিত্তের এমন সর্বোত্তম প্রকাশ দেখা যায়। ভগবানের ভগবত্ত্বই এই জাতীয় গানের আশ্রয় অবলম্বন।

শান্তরসের সাধনায় সাধারণ পিতা মাতা-বন্ধু-সখা বা প্রিয়ের সম্পর্ক থাকে না। অভিনবগুপ্ত শান্তরসকে "আধ্যাত্মিক মোক্ষের এবং তত্ত্বজ্ঞান লাভের হেতু এবং নিঃশ্রেয়সের ধর্ম-যুক্ত"[১৮] বলে চিহ্নিত করেছেন। শাক্তগানে শান্তরসের এমন অহৈতুকীভক্তিপ্রাণতা ও নিঃশর্তে আত্মনিবেদনের ভাবটি মূর্ত হয়ে উঠেছে। সমালোচকের ব্যাখ্যায়- "ভক্তিপূত বীররসের সাধনায় চিত্ত দীর্ঘশালী হইলে অদ্ভুত রসময়ী দেবীর ভাবমূর্তি উপলব্ধি হইতে থাকে, ক্রমশ জাগে দিব্যভক্তি ও দিব্যরস, তাহারই পরিণতী শান্তরসে।"[১৯] রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রমুখ সাধকেরা মাতৃসাধনার উচ্চস্তরে উপনীত হয়েছিলেন। উভয়েরই মাতৃদর্শন হয়েছিল। উভয়েই মাতৃপাদপদ্মে ভ্রমর বৃত্তিকে জীবনের সার করেছিলেন। রিপুবাসনা ত্যাগ করে, ইহজাগতিক সুখ জলাঞ্জলি দিয়ে মাতৃনামের মহামন্ত্রকে জীবনের ধ্রুবতারা করেছিলেন। রামপ্রসাদ গেয়েছেন—

আর কাজ কি আমার কাশী?
মায়ের পদতলে পড়ে আছে গয়া গঙ্গা বারনসী।
হৃৎ-কমলে ধ্যান-কালে আনন্দ-সাগরে ভাসি। *[রামপ্রসাদ]*
কালী কালী বল রসনা রে
ও মন ষট্ চক্রে – রথ মধ্যে- শ্যামা মা মোর বিরাজ করে।...
তীর্থগমন, মিথ্যাভ্রমণ, মন উচাটন করো না রে।
ও মন, ত্রিবেণীর ঘাটেতে বৈস, শীতল হবে অন্তঃপুরে। *[রামপ্রসাদ]*

'তারা' নামকে সর্বস্ব করেছিলেন—

এমন দিন কি হবে তারা
যবে তারা বলে, তারা বেয়ে পড়বে ধারা।।
হৃদিপদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে,
তখন ধরাতলে পড়বো লুটে, তারা বলে হব সারা।। *[রাম প্রসাদ]*

কমলাকান্তও মাতৃনামের মহামন্ত্রকে কণ্ঠে বেঁধে আপনার জীবনতরী ভবপারাবারে ছেড়ে দিতে চেয়েছেন—

মনপবনের নৌকা বটে ছেড়ে দে শ্রীদুর্গা বোলে।
মন মহামন্ত্র যন্ত্র যার সুবাতাসে বাদাম তুলে।। *[কমলাকান্ত]*

তাই বলা যায় শাক্তপদাবলি নিছক ধর্মকাব্য বা শাক্তের সাধ্য-সাধন সম্পর্কিত শুষ্ক তত্ত্বকথা নয়, এগুলি ব্রহ্মময়ী রসেশ্বরীর রসরূপ বাণীভাষ্য। শাক্তপদাবলির এই রসাশ্রয়ীস্বরূপই গানগুলিকে একাধারে Art for soul sake এবং Art for Art's sake-এর কোটারিভুক্ত করেছে।

উল্লেখপঞ্জি:

১. 'বিশ্বেকোষ', (**১৬শ** খন্ড)/ নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত/ **১**ম সং-১৮৮৬, পুনঃমুদ্রণ- **১৯৮৮**/বি.আর. পাবলিশিং/দিল্লী/পৃ.২৭১.
২. উল্লেখসূত্র- 'কাব্যজিজ্ঞাসা', /অতুলচন্দ্র গুপ্ত /২য় সং-১৩৯৮, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ/ কোলকাতা/ পৃ.৩০
৩. 'রস-সমীক্ষা'/ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়/ **১**ম সং-১৩৮৪/ সংস্কৃত পুস্তকভান্ডার/কোলকাতা/পৃ.৩২
৪. 'অলঙ্কার-চন্দ্রিকা'/ শ্যামাপদ চক্রবর্তী/পুনঃমুদ্রণ **১৯৯৫**/বামা পুস্তকালয়/কোলকাতা/পৃ.২৫৮
৫. 'বৈষ্ণব রস-প্রকাশ'/ক্ষুদিরাম দাস/ সংশোধিত (বইপত্র) সং **১৩৯১**/ বইপত্র/কোলকাতা/পৃ.২৩৪।.
৬. 'রস-সমীক্ষা'/ঐ/পৃ. ১৫ -১৬.
৭. 'কাব্যালোক' (**১**ম খন্ড)/সুধীরকুমার দাশগুপ্ত/ ৪ সং/এ.মুখাজি এন্ড কোং/কোলকাতা/পৃ.২১০।
৮. ঐ/ পৃ.২১১
৯. ঐ/ পৃ.২১৫
১০. ঐ/পৃ.২১৫
১১. 'শাক্ত পদাবলী' (চয়ন)/ অমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত/**১১**শ সং/ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/ ভূমিকা দ্রষ্টব্য
১২. 'কাব্যালোক' (**১**ম খন্ড)/সুধীরকুমার দাশগুপ্ত/ ঐ/পৃ.২২০
১৩. ঐ/পৃ. ২২০-২২১
১৪. ঐ/পৃ.১৯০
১৫. ঐ/পৃ.১৯০
১৬. 'শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা'/জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী/**৩**য় সং/ডি.এম.লাই./কোলকাতা/পৃ.১৬১।
১৭. 'নাট্যশাস্ত্র'/ভরতাচার্য/ উল্লে**খ**সূত্র- 'কাব্যালোক,' (**১**ম খন্ড)/ঐ/পৃ.১৮১
১৮. 'অভিন**ব**ভারতীভাষ্য'/অভিনবগুপ্ত/ উল্লে**খ**সূত্র- 'কাব্যালোক,' (**১**ম খন্ড)/ঐ/পৃ.১৯০
১৯. 'কাব্যালোক,' (**১**ম খন্ড)/ঐ/পৃ.২২২-২২৩

[গানগুলো সবই 'শাক্ত পদাবলী' (চয়ন)/ অমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত/**১১**শ সং/ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-থেকে গৃহীত]